কথোপকথনে তরুণ কবি শ্রীজাত

অনুলিখন: মোনালিসা মুখার্জী ও কৌশিক দত্ত
EMAIL: monamukherji@gmail.com
kausik.datta@gmail.com

শ্রীজাত – এই নামেই পরিচিত শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাবান তরুণ বাঙ্গালী কবি, নব্যযুগের বাঙ্গালী পাঠকমহলে অনাবিল স্বীকৃতির পথে উদীয়মান এক নক্ষত্র। ১৯৭৫ সালে কলকাতায় জন্ম; পড়াশোনা এবং বেড়ে ওঠা এই শহরেই, তাই কলকাতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে তাঁর কবিতায়। আপাতশান্ত, ধীর, সুভদ্র তরুণ কবির অন্তরস্থিত অস্থিরতাই হয়ত তাঁকে উজ্জীবিত করে, প্রেরণা যোগায়, ঠেলে দেয় সৃষ্টির পথে – প্রদান করে সেই ক্ষমতা, যার সাহায্যে কবি সম্মোহিত করে রাখেন পাঠক-পাঠিকাকে, এবং প্রতিবার তাদেরকে হতচকিত করে নতুন ভাবে, নতুন আঙ্গিকে নিজেকে প্রকাশ করেন।

'ছোটদের চিড়িয়াখানা', 'বর্ষামঙ্গল', 'অকালবৈশাখী', 'লিখতে হলে ভদ্রভাবে লেখ', এবং সদ্যপ্রকাশিত 'কফির নামটি আইরিশ' সমেত তিনি প্রায় ৮-টি কাব্যগ্রন্থের স্রষ্টা, এবং ২০০৪ সালে 'উড়ন্ত সব জোকার' বইটির জন্যে আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। এহেন শ্রীজাত-র সঙ্গে আলাপ করার একটি আকস্মিক সুযোগ মিলে যাওয়া তে যারপরনাই আনন্দের সঙ্গে আমাদের দুই বন্ধু, মোনালিসা ও শমীক, হইহই করে উপস্থিত হয় শ্রীজাত-র কর্মস্থলে। স্বল্পবাক, সহাস্যমুখ তরুণ কবি ব্যস্ততার মধ্যেও গল্প করে যান আমাদের সঙ্গে।

প্রশ্ন ছিল তাঁর কাব্যজীবনের শুরু নিয়ে। শ্রীজাত জানালেন, যে পরিবারে তাঁর জন্ম, তার সম্পর্ক ছিল মূলতঃ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে। মাতামহ তারাপদ চক্রবর্তী প্রথিতযশা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন; বাড়িতে গানের চল, মা ও গান করেন। পরিবারের সকলের মতো তাঁরও ধারণা ছিল বড় হয়ে নিশ্চয় গানই গাইবেন, সঙ্গীতকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করবেন। কিন্তু একটা সময়ের পর তিনি দেখলেন যে গানের মাধ্যমে নিজের অন্তরসত্তাকে প্রকাশ করতে একটু অসুবিধে হচ্ছে। চেষ্টা করলেন অন্য বিভিন্ন মাধ্যম পরখ করে দেখতে; কখনও এঁকেছেন, কখনও বা অন্যান্য কাজ করেছেন। কিন্তু তারপর লেখায়ে এসে বুঝলেন যে এটাই তাঁর উপযুক্ত মাধ্যম; আর পাঁচজন বাঙ্গালীর মতো ক্লাস 6-7 এ কবিতা লেখা তিনিও শুরু করেছিলেন, কিন্তু এই মাধ্যমের উপযুক্ততা পুরোপুরি অনুভব করেন কলেজে (দক্ষিণ কলকাতার ‘আশুতোষ’) উঠে। বুঝতে পারেন যে কবিতার মধ্যে দিয়েই নিজেকে ঠিকঠাক প্রকাশ করতে পারছেন, আর সেই সময় থেকেই seriously লেখালেখির চেষ্টা করছেন।

আমরা কৌতুহল প্রকাশ করি শ্রীজাত-র কবিজীবনের দিগ্‌দর্শক সম্পর্কে, প্রশ্ন রাখি যে অনেক সময় একটা guidance লাগে, ঠিক-বেঠিক, বিষয় নির্বাচন, রাজনৈতিক, সামাজিক বা নিছক প্রেমের কবিতা – কোনটা ভাল লাগছে, তা সব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার জন্য। তা এই ব্যাপারে শ্রীজাতকে guide কে বা কারা করেছেন?

শ্রীজাত অকুণ্ঠ স্বীকার করেন, যে সবচেয়ে প্রথমে তাঁর guide ছিল বন্ধুরাই, যারা তাঁর থেকে অনেক বেশী কবিতা পড়েছিল তার মধ্যেই; তারা তাঁকে ভীষণ ভাবে চালনা করত; তারপর বাড়ির লোকজনের সহায়তা এবং কাব্যজগতের পুর্বসূরীদের আনুকুল্যে লেখার কাজ চালিয়ে গেছেন। বাড়ির লোকেদের শুরুতে একটা আক্ষেপ হয়ত ছিল যে গানটা সেভাবে নেননি, কিন্তু সৃজনমূলক শিল্প ছেড়ে বেরিয়ে যাননি সেই সান্ত্বনায় ধীরে ধীরে সবাই মেনে নিয়েছেন, ও উৎসাহ দিয়েছেন।

প্রথম বই প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৯ সালের বই মেলায়। ‘প্রথম আলো’ বলে একটি প্রকাশনা সংস্থা একটি উল্লেখযোগ্য আয়োজন করেন; এদিক ওদিক লেখা প্রকাশিত হলেও যাদের কোনো বই নেই এবং কেউ তেমন চেনে না, সেরকম একশো জন তরুণ কবির একশোটা বই প্রকাশনার বন্দোবস্ত করেন, যদিও খুবই ছোট্টো আকারে, ষোলো পাতা করে। সেভাবেই ‘শেষ চিঠি’ নামে শ্রীজাত-র প্রথম বই জনসমক্ষে আসে। প্রথম বইয়ে নাম ‘শেষ চিঠি’ জেনে আমরা বেশ কৌতুক উপভোগ করি।

ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করতে করতে শ্রীজাত বলেন, যে তিনি স্বভাবতই মুখচোরা এবং লাজুক প্রকৃতির, তাই প্রকাশকদের দরজায় দরজায় ঘুরে ঘুরে নিজে গিয়ে approach করা, এটা কখনই তাঁর পক্ষে হয়ে ওঠে নি। তার পরের বছর রোদ্দুর নামের একটা ছোট্টো পত্রিকা চৌকোমাপের আবার সেই ষোলো পাতার আর একটা বই প্রকাশ করে, যেটার নাম ‘দু-চার কথা’। পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রথম বই, নাম ‘লিখতে হলে ভদ্রভাবে লেখ’, সপ্তর্ষি প্রকাশন থেকে তার পরের বছর প্রকাশিত হয়। এরই মাঝখানে আবার সৃষ্টি প্রকাশন থেকে বেড়িয়েছে ‘অনুভব করেছি তাই বলছি’। লোকজন এই সময়ে অল্পস্বল্প তাঁর লেখা পড়ছিলেন, এবং পড়ে তাঁকে জানিয়েওছেন। সেই feed back টুকু তাঁকে আশ্বাস জোগায় যে তাঁর লেখা অন্তত এক জন হলেও, পড়ছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম জনসমক্ষে তাঁর স্বীকৃতি প্রাপ্তির কথা। ২০০৪ সালে আনন্দ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত বই ‘উড়ন্ত সব জোকার’-এর জন্য আনন্দ পুরস্কার আর কৃত্তিবাস পুরস্কারে ভূষিত হন শ্রীজাত, এবং অকপটে স্বীকার করেন, যে এই প্রাপ্তিযোগে খুবই আশ্চর্যান্বিত হন এবং নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন। এই সবের ফলে এই লেখাগুলো যদি আর একটু বেশী মানুষের কাছে পৌঁছে যায়, সেটাই হবে তাঁর পরম প্রাপ্তি। এরপরে প্রত্যেক বছর একটা, বা কোনো বছর দুটো, এরকম ভাবেই চলছে, এবং তার সঙ্গে নিত্যসঙ্গী লেখালেখি।

শ্রীজাত-র লেখার মধ্যে একটা পরস্পরবিরোধী ভাব আছে, যেটাকে ঠিক মানুষ শ্রীজাত-র সঙ্গে মেলানো যায় না। অনেক কবিতায় যেন একটা superiority complex-এর ছোঁওয়া থাকে। সদ্যশেষ বইমেলায় পঠিত তেমনই একটি কবিতার কথা উঠলে শ্রীজাত-ই মনে করিয়ে দেন উদ্ধৃতিটি, "...বাওয়াল করবেন না দাদা, ঝামেলা করবেন না..."। ব্যক্তিত্বের এই আপাত-বৈপরিত্য নিয়ে আমাদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজাত সহজভাবেই বলেন, যে এই বৈপরিত্যটা অনেকের মধ্যেই পাওয়া যায়। অনেকে, যারা শান্ত, স্থির, নিজের মধ্যে ডুবে থাকেন, তারা যখন লিখছেন, সেই লেখায় ফুটে উঠতে পারে অমিতশক্তিশালী কোন এক ব্যক্তিত্ব। শ্রীজাত-র নিজের মধ্যে হয়ত এরকমই কিছু চাপা কোথাও থাকে, ব্যবহারিক জীবনে যা প্রকাশ পায়না, সেগুলো প্রতিফলিত হয় তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে – দ্বৈতসত্তা, যা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই থাকে, তার অভিব্যক্তি কবির ক্ষেত্রেও অন্যথা হয়না।

শ্রীজাত-র কবিসত্তার একটা অজানা দিকও ফুটে ওঠে এর মধ্যে। প্রতিটি কবিতাই যেন তাঁর অন্তর্চিন্তার মুহূর্তের অনুভাব, যে মুহূর্ত আর ফিরে আসবে না; তাই প্রতিটি কবিতা তাঁর কাছে নিজস্ব। সে কারণেই লেখার সময় তিনি খুব মনঃসংযোগ করেন, পরিবর্তন করতে হলে যখন লেখাটা ভাবেন, তখনই করেন; খাতায় লেখেন কোন কাটাকুটি ছাড়াই fresh, final version, এবং একবার লেখা হয়ে গেলে আর ওই লেখাটা পড়তে চান না, ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না কোন লেখার কাছে।

আজ প্রায় ১৫-১৬ বছর ধরে লিখছেন শ্রীজাত, বলেন যে আজ পুরোনো কোন লেখা বা বই তুলে দেখলে নিজেই প্রচণ্ড লজ্জা পান, লেখাগুলোকে খুবই অসম্পূর্ণ বা অসংলগ্ন মনে হয়, পাঠক মহলের কাছে সেটা পৌঁছে গেছে এবং ফিরিয়ে আনার কোনো উপায় নেই – জ্যামুক্ত তীরের মতন – সেটা ভেবে কষ্টে ভোগেন। একটা বই বেরোনোর দু-তিন মাস পরে একবার পড়ে দেখলে মনে হয়, "এটা কি হল! এটাতো উচিত হল না?", মনে হয় লেখাগুলো সব ফিরিয়ে নিয়ে নতুন করতে পারলে ভাল হত – যেটা অসম্ভব, কিন্তু ওই বইটা

একটা ব্যর্থতার দলিল হিসেবে থেকে গেল। সেই যন্ত্রনার উপায় জানতে একবার কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সুনীল গভীর সমবেদনার সঙ্গে বলেছিলেন, এটা তো সবারই হয়, এর একটাই উপায় – পরের বই, চেষ্টা করা যেন পরের বইটা ভালো হয়। কিন্তু সেই অতৃপ্তি শ্রীজাত-র যায়নি; হয়ত সেটা যাবারও নয়, সেটাই মুহুর্মুহু তাঁকে অন্য থেকে অন্যতর সৃষ্টির পথে তাড়িয়ে নিয়ে চলে।

অন্য ধরণের লেখার কথা উঠতে শ্রীজাত জানালেন যে গদ্য লিখতে চান অনেক সময়, হয়ে ওঠে না – তার কারণ – কবির মতে বৌদ্ধিক 'আলস্য' – কবিতার ক্ষেত্রে ভাবার প্রয়োজন বা অনুশীলনটা অনেক বেশী। একটা কবিতা মাথায় দশ-বারো দিন কি এক মাস ধরে ঘোরে, তৈরি হলে লিখে ফেলেন সুবিধামত। কিন্তু গদ্য লিখতে হলে অনুশীলন আর নিষ্ঠা লাগে, যেটা তাঁর এখনো তৈরি হয়নি। ফলে তিনি পারতপক্ষে গদ্য থেকে একটু দূরেই থাকেন। কর্মক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত, সেখানে feature লেখার কাজ করতে হয়, copy-edit-এর কাজ এবং কিছু অনুবাদেরও কাজ থাকে, কিন্তু সেগুলো কে তিনি তাঁর কবিতার জগত থেকে পৃথক রাখেন সযত্নে।

তবে সেই রাজনৈতিক ধ্যানধারণা কি একেবারেই কবিতায় ঢুকে যায় না? শ্রীজাত বলেন, যে এখনকার পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক পত্রিকায় কাজ না করেও যদি শুধু বাড়িতেও বসে থাকা যায়, তাহলেও আমরা কেউই আর রাজনীতির বাইরে নেই। দূরদর্শনে, খবরের কাগজে, এমন কি পাড়ার দোকানে চা খেতে গেলেও যে ভাবে রাজনীতি আমাদের ছুঁয়ে যায়, তাতে লেখায় প্রভাব পড়তে বাধ্য।

তবে প্রেমের কবি, বিদ্রোহী কবি, এরকম মনগড়া categorization-এ একদমই বিশ্বাসী নন শ্রীজাত। কারণ একজন মানুষ কখনও শুধুই প্রেমের কবি হতে পারে না, হলে সেটা তার দুর্বলতা। কাররই জীবনটা নিশ্চয় শুধু প্রেমের নয়, জীবনে রাজনীতিও আছে, দুঃখও আছে, প্রতিবাদও আছে। শ্রীজাত যখন

যে ভাবে অনুভব করেন, সেই ভাবে প্রতিবাদ করেন, কি প্রেম নিবেদন করেন, কি বর্ণনা দেন। প্রেমের কবি বা প্রতিবাদের কবি বলে নিজেকে আলাদা করে সীলমোহর দিতে চান না।

এদেশের অন্যান্য ভাষাভাষী ও দেশের বাইরের বিভিন্ন কবির সঙ্গে মিশে এবং তাদের কবিতা পড়ার অভিজ্ঞতা থেকে, তাদের অবস্থানটা অনেকটাই আলাদা বলে মনে করেন শ্রীজাত। তাঁর কথায়, বাংলায় লেখালেখি বা কবিতা লেখার যে একটা ভাষাগত সুবিধা, সেটা অনেক অন্যান্য ভারতীয় বা বিদেশী ভাষায় নেই। সেই দিক থেকে তাঁর মনে হয় আমরা অনেকটাই বরপ্রাপ্ত, যে আমরা এমন একটা চমৎকার ভাষা পেয়েছি যেটা কবিতার জন্যে খুব লাভজনক, খুব ভালো ভাষা।

ছোটোবেলায় পড়া সহজ পাঠ এখনো শ্রীজাত-র অন্যতম প্রিয় বই। সেই সঙ্গে সুকুমার রায়, যিনি ছোটোবেলায় একভাবে প্রভাবিত করেছিলেন এবং বয়ঃকালে অন্যভাবে করেন। আস্তে আস্তে একটা সময়ের পর জীবনানন্দ দাস পড়ার ও বোঝার চেষ্টা করেছেন; তাছাড়া, ৫০ এবং ৭০-এর দশকে যারা লিখেছেন, এখনও লিখছেন এবং early 90s-এ যারা এই সময়কার একটু আগের কবি, তাদের লেখাও সেরকম ভাবেই পড়েন। শ্রীজাত মনে করেন, কোন এক জন কবির প্রভাব রয়েছে, বাকিদের কোনো প্রভাব নেই, এটা হওয়া খুব মুশকিল। একজন তরুণ কবি যদি ঠিক মতন বেড়ে ওঠেন, তাহলে পূর্বসূরীদের সবারই কিছু না কিছু প্রভাব থাকবেই, থাকাটা উচিত।

আমাদের একটা কৌতুহল ছিল, যেহেতু শ্রীজাত-র সঙ্গীত ও কবিতা দুয়েরই background আছে, তাই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের অনেক চারণকবি ও সঙ্গীতকারের মতন উনিও গান আর কবিতা মিশিয়ে কিছু করার কথা কখনো ভেবেছেন কিনা। এই প্রশ্নের সম্মুখীন ইতিপূর্বেও হয়েছেন শ্রীজাত, তাঁর বক্তব্য কবিতাই তাঁর প্রাণের কাছাকাছি, তাই তাতে এতখানি সময় দিচ্ছেন; এর সাথে

আবার গান ঢুকলে, না হবে গান, না হবে কবিতা। তাই কবিতায় মন দিয়ে শুধু কবিতা লেখার চেষ্টা করাটা ওঁর পক্ষে বাঞ্ছনীয়।

কবিতার মাধ্যমেই স্ত্রীর সাথে আলাপ শ্রীজাত-র। তিনি সলজ্জ হেসে জানালেন, যে কবিতার জন্যেই সে তাঁকে বিয়ে করে এবং কবিতা লেখেন বলেই এখনো ছেড়ে যায়নি, তাই ওটাই নাকি তাঁর এক মাত্র ঢাল বা safe guard... শ্রীজাত-র দৃঢ় ধারণা, যে ওঁরা যে রকম ছন্নছাড়া প্রকৃতির মানুষ, ওঁদের মতন লোকজন কবিতা লেখা বন্ধ করে দিলে কোনো মেয়ে সঙ্গে থাকতে রাজী হবে না। ফলে তিনি প্রাণ-পণ চেষ্টা করেন যে কবিতা লেখাটা টিকিয়ে রাখতে, কবির কথায়, “যাতে বউ থেকে যায়”; তাঁর কবিতা লেখার পিছনে স্ত্রীর অনেকই অবদান আছে, কারণ তিনি নিজে সর্বদা নিত্যনৈমিত্তিক সবকিছু পেরে ওঠেননা, যেটা তাঁর সহধর্মিনী মেনে নেন এবং সেই জায়গাটা ছেড়ে দেন যাতে তিনি লেখালেখির দিকে থাকতে পারেন।

পরিপূর্ণ হৃদয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমরা উঠে এলাম সেদিনকার মতো।